গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৫ সংখ্যা ৩০ আগস্ট - ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ Web: https://ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ৩ টাকা

ছাত্রদের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ

রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর ছাড়া অন্য কর্মসূচিতে স্কুলছাত্রদের অংশগ্রহণ করায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৪ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন,

শিক্ষা দপ্তরের কর্মসূচি ছাড়া স্কুলছাত্রদের অন্য কোনও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে রাজ্যের মুখ্যসচিব জেলাশাসকদের যে নির্দেশ জারি করার ফতোয়া দিয়েছেন আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি। এই সার্কুলার ১৯০৫ সালের কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ আটকাতে ব্রিটিশ সরকারের বাংলার সচিব কার্লাইল এমন সার্কুলার জারি করেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধারা তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। আজ তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও আর জি কর হাসপাতালের ডাক্তার-ছাত্রীর নারকীয় ধর্ষণ-খুনের ন্যায়বিচারের দাবিতে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর প্রতিবাদ কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বন্ধকরতে তেমন নির্দেশই জারি করেছে। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি পশ্চিমবঙ্গেও চালু করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সরকার যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী ছাত্র তথা শিক্ষা আন্দোলন গড়ে উঠছে। আগামী দিনে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধেও এই সার্কুলার প্রয়োগ করা হবে বলেই আশঙ্কা। উল্লেখ্য, বিগত সরকারের প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ছাত্ররাই প্রথম আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। আমরা অবিলম্বে রাজ্য সরকারের এই কালা-নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

আর জি কর ঃ শেষ না দেখে
রাস্তা ছাড়বে না মানুষ

তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট দেওয়া পর্যন্ত সিবিআইয়ের আট দিনের তদন্ত আপাতত মূষিক প্রসব করল। অথচ দেশের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল এই সিবিআই রিপোর্টের জন্য। তদন্তে পুলিশের পদে পদে গাফিলতি, ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য বলে জনমনে যখন প্রায় নিশ্চিত ধারণা তৈরি হয়েছিল তখন হাইকোর্টের দেওয়া সিবিআই তদন্তের নির্দেশ কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসা, আর জি করের ঘটনার বিচার পেতে ব্যগ্র মানুষের মনে বাড়তি আগ্রহ তৈরি করেছিল। কিন্তু আট দিন পরে যখন সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দিল এবং তাতে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করা হল না, তা জনমনে হতাশাকে গভীর করে তুলল। আদালত এবং

সাতের পাতায় দেখুন

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষক-অধ্যাপকদের মিছিল। ২৪ আগস্ট, কলেজ স্ট্রিট

সর্বাত্মক সঙ্কট থেকে দেশকে বাঁচাতে বিপ্লবী রাজনীতি বুঝতে হবে
৫ আগস্টের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবস ৫ আগস্ট কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত জনসভায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ প্রকাশ করা হল।

গত বছর ঠিক এই দিনেই আমরা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সর্বহারার মহান নেতা, আমাদের শিক্ষক, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করেছি লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশের মধ্য দিয়ে। তাঁর জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন দুটিই ৫ আগস্ট। আজ কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকে স্মরণ করে ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ধারণ করার জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচন আপনারা দেখেছেন। ফলাফল কী, তা-ও আপনারা জানেন। নির্বাচন সম্পর্কে বহুদিন আগে কমরেড শিবদাস ঘোষ যা বলে গেছেন, প্রথমে তা আমি এখানে শোনাতে চাই— ‘ইলেকশন হচ্ছে একটা বুর্জোয়া পলিটিক্স, জনগণের রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে, সচেতন সংঘশক্তি না থাকলে, শিল্পপতিরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা বিপুল টাকা ঢেলে এবং সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে যে হাওয়া তোলে, যে আবহাওয়া তৈরি করে, জনগণ উলুখাগড়ার মতো তাতে ভেসে যায়।’ এ বারের নির্বাচনে এটা যে ঘটেছে, আপনারা তা লক্ষ করেছেন। এই নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে বুর্জোয়া রাজনীতি, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতি কতটা অধঃপতিত, কতটা নোংরা কুৎসিত রূপ ধারণ করতে পারে। দিল্লির সিংহাসনে কে বসবে, এই রাজ্যে কে ক’টা সিট দখল করবে— এই লড়াইয়ে জাতীয় বুর্জোয়া, আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলি একে অপরের উদ্দেশে যে ভাবে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করেছে, নোংরা উক্তি করেছে এবং যে কদর্যতা প্রকাশ করেছে,

দুয়ের পাতায় দেখুন

পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আজ গণতন্ত্র ধ্বংসকারী ফ্যাসিবাদে পরিণত

একের পাতার পর

তা প্রমাণ করে আজ বুর্জোয়া রাজনীতি, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতি কত কুৎসিত অবস্থায় পৌঁছেছে। একই জিনিস ঘটছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমী দুনিয়ার দেশগুলির নির্বাচনে। আবার ঠিক এই সময়েই এই বুর্জোয়া রাজনীতির নির্মম ফ্যাসিস্ট আক্রমণ চলছে প্রতিবেশী বাংলাদেশে।

পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আজ গণতন্ত্র ধ্বংসকারী ফ্যাসিবাদে পরিণত

পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে— 'বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল অফ দ্য পিপল'— জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য এবং জনগণেরই— এই আহ্বান নিয়ে, যা একদিন আমেরিকার স্বাধীনতার যোদ্ধারা তুলেছিলেন। আর পরবর্তীকালে এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অ্যাটম বোমা ফেলে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে লক্ষ লক্ষ নারী-শিশু-যুবক-বৃদ্ধকে হত্যা করেছে। কিছু দিন আগে এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ডাহা মিথ্যা অভিযোগ তুলে ইরাক আক্রমণ করে দেশটিকে ধ্বংস করেছে, লিবিয়াকে ধ্বংস করেছে, আফগানিস্তানেও হত্যালীলা চালিয়েছে। এখন এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই ইজরায়েলকে অস্ত্র সাহায্য দিয়ে প্যালেস্টাইনে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ হাজারের মতো প্যালেস্টিনীয়কে খুন করেছে। এই মুহূর্তেও হত্যালীলা চলছে সেখানে। কত শিশু, কত নারী-কত মানুষ হত-আহত হয়েছে! কত স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল ধ্বংস করেছে! আবার, ইউক্রেন কার দখলে থাকবে, এই নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। এক দিকে রুশ সাম্রাজ্যবাদ ইউক্রেন আক্রমণ করছে, অন্য দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে ন্যাটো সশস্ত্র সাহায্য দিয়ে ইউক্রেনকে মদত দিচ্ছে। এর ফলেও অসংখ্য পুরুষ-নারী-শিশু, গ্রাম-শহর ধ্বংস হচ্ছে।

যুদ্ধ আজ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন। কারণ, শুধু পরদেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্যই নয়, যুদ্ধাস্ত্র শিল্পকে চাঙ্গা রাখার জন্যও যুদ্ধ প্রয়োজন। বিশ্বযুদ্ধ না হলেও বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ এই সব যুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছে। মার্কিন-কংগ্রেস তো পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির ভিত্তিতে নির্বাচিত, অথচ তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই যুদ্ধকে সমর্থন করছে! রাশিয়ার পার্লামেন্টও রুশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করছে। তা হলে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আজ কোথায় পৌঁছেছে! পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আজ স্বাধীনতা ধ্বংস করছে, গণহত্যা করছে। বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির এই হচ্ছে আজকের চেহারা। পার্লামেন্ট আছে, ডেমোক্রেসি নেই, আছে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ধ্বংসকারী ফ্যাসিবাদ।

১৯৪৯ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ভারতবর্ষের পুঁজিপতি শ্রেণি ফ্যাসিবাদ কায়েম করছে। তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও তিনি দেখিয়েছেন। প্রথমে কংগ্রেস এর ভিত্তি স্থাপন করেছে, আর এখন বিজেপি তাকে আরও পাকাপোক্ত করছে। তখন বামপন্থী দলগুলি এ কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। আজ তো 'ফ্যাসিবাদ' কথাটা মানুষের মুখে মুখে। বাস্তবে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির ঠাটবাট বজায় রেখেই ফ্যাসিবাদ চলছে।

পুঁজিবাদী শোষণের অনিবার্য পরিণাম অর্থনৈতিক বৈষম্য

আমাদের দেশে একটা আলোচনা চলে, সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি চলে যে, ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে, সংকট বাড়ছে। এটা সকল সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশেই ঘটছে। কিন্তু কেন অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে? তার উত্তর তারা দিতে পারছে না। এটা কি আপনাআপনি ঘটছে, এটা কি অনিবার্য? তারা উদ্বেগ বোধ করছে যে, এর ফলে দেশে অশান্তি বাড়বে। মানে এর বিরুদ্ধে জনগণ মাথা তুলে দাঁড়াবে। তার জন্য নানা প্রস্তাব আসছে, নানা তত্ত্ব আসছে, কিন্তু কোনওটাই কাজ করছে না। বহুদিন আগে বুর্জোয়া অর্থনীতির উদগাতা অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন, শ্রমশক্তিই সমাজের সমস্ত সম্পদের স্রষ্টা। সৃষ্টি হওয়া সম্পদের একটা ভাগ পাবে পুঁজির মালিক, আর একটা অংশ মজুরি হিসেবে পাবে শ্রমিক। মার্ক্স বললেন, তোমাদের সেন্স অফ জাস্টিস বেসড আপন ইনজাস্টিস (তোমাদের ন্যায়ের ধারণা অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত)। যে শ্রমিক সম্পদের স্রষ্টা, তার ফলে পুঁজিরও স্রষ্টা, সে কেন সেই সম্পদের সম্পূর্ণ অধিকারী হবে না? মার্ক্স অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন, মালিক যা লাভ করে তা শ্রমিককে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেই করে। সারপ্লাস ভ্যালু (উদ্বৃত্ত মূল্য), যেখান থেকেই মালিকের মুনাফা আসে, সেই সারপ্লাস ভ্যালু আসে আনপেইড লেবার পাওয়ার থেকে। যে শ্রমশক্তির মূল্য শ্রমিক পায় না তা থেকেই মালিক লাভ করে। তার ফলেই জন্ম হয় অর্থনৈতিক বৈষম্যের। এর ফলে যে শ্রমিক-জনগণ ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয় সেই জনগণই বাজারের অধিকাংশ ক্রেতা। ফলে দেখা দেয় বাজার সংকট। যার ফলে কল-কারখানা বন্ধ হয়। ছাঁটাই হয়। বেকারত্ব বাড়ে। পুঁজিবাদ থাকলে এ সব সংকট আসবে এবং ক্রমাগত বাড়বে।

ফরাসি বিপ্লব যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান তুলেছিল সেই সাম্য আজ কোথায় দাঁড়িয়েছে? পৃথিবীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনকুবের বিপুল সম্পদের মালিক। আমাদের দেশের ১ শতাংশ ধনী ৪০ শতাংশ সম্পদের মালিক, ৫ শতাংশ ধনী ৬০ শতাংশ সম্পদের মালিক। আর নিচুতলার ৫০ শতাংশ মানুষ মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদের মালিক। ৮৩ কোটি মানুষের দৈনিক আয় মাত্র ২০ টাকা, ২৫ কোটি মানুষের দৈনিক আয় ১৬৬ টাকা। মুকেশ আম্বানির মূল সম্পদ ১০ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৪৪ কোটি টাকা। সম্প্রতি তার ছেলের বিয়ে হল পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে। আগেকার দিনের রাজা মহারাজারা, মুঘল বাদশারাও এই রকম রাজসিক উৎসব ভাবতে পারত না। এই রাজকীয় উৎসবে বিভিন্ন দেশের শিল্পপতিরা তো এসেছেই, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এসেছেন, সব দলের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরাও ভিড় করেছেন এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও গিয়েছিলেন। কেন? কারণ খোদ রাজার বাড়ির বিয়ে, তার আশীর্বাদপুষ্ট নেতারা না গিয়ে পারে! তা হলে দেখুন, বাস্তবে দেশে রাজত্ব কারা চালায়? এই সমস্ত শিল্পপতি-পুঁজিপতিরাই রাজত্ব চালায়। আর এই রাজনৈতিক দলগুলি হচ্ছে তাদের কেনা চাকর। সরকারে বসে এরা তাদের স্বার্থেই কাজ করে। এই সব দলগুলি ইলেকশনে যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে, তা তারা কোথা থেকে পায়? এই শিল্পপতিরাই দেয়, পুঁজিপতিরাই দেয়। কেন তারা দেয়? তারা চায় তাদের স্বার্থেই সরকার চাকরের কাজ করুক। সব সরকারি দলই তাই করছে। ফলে নির্বাচন বলে যা কিছু হয়, সেটাও বুর্জোয়া শ্রেণিই ঠিক করে, জনগণ নয়। বাস্তবে 'ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন ইজ এ বিগ ডিসেপসান' (অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আজ বাস্তবে একটা বিরাট লোকঠকানো বিষয়ে পরিণত হয়েছে)।

বুর্জোয়া দলগুলির ভক্তি শুধু সরকারি গদিতে

বিজেপিও বুর্জোয়া শ্রেণির দল, কংগ্রেসও বুর্জোয়া শ্রেণির দল। দীর্ঘদিন কংগ্রেস বুর্জোয়া শ্রেণির হয়ে কাজ করেছে। এখন বিজেপি কাজ করছে। এই দুজনেই নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে পরিচয় দেয়। সব দেশেই এমনটা পাবেন। আমেরিকাতে আছে রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাট দল। ইংল্যান্ডে লেবার পার্টি আর কনজারভেটিভ পার্টি। আমাদের দেশেও তেমনি বিজেপি এবং কংগ্রেস। পুঁজিপতিরা কখনও একে গদিতে বসায়, কখনও ওকে। এক দল জনপ্রিয়তা হারালে আরেক দলকে বসায়। কেউ একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলে জোট করে সরকার চালায়। এই জিনিসটাই বারবার ঘটছে নির্বাচনে। আর সাধারণ মানুষ? তারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা মনে করে আমরা অত শত বুঝি না। দিন আনি দিন খাই— নেতারাই যা হোক ঠিক করবে। আর ভোটের সময় টিভিতে কী প্রচার হচ্ছে, খবরের কাগজ কী প্রচার করছে, কোন দলকে ভোট দিলে কত টাকা পাওয়া যাবে, কে কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে টাকা দেবে— এই সব দেখেই মানুষ ভোট দেয়। এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তৃণমূল কংগ্রেস শুরু করেছিল পশ্চিমবাংলায়। এখন সব রাজ্যেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো আরও নানা রকমের ভাণ্ডার শুরু হয়ে গেছে। একদল যদি বলে আমি বারোশো টাকা দেব, অন্য দল বলে আমি দেড় হাজার টাকা দেব। এই বিষয়ে দেশের অন্য দলগুলিকে পথ দেখানোর কৃতিত্ব দাবি করতে পারে তৃণমূল। এগুলি সবই ভোট পাওয়ার ভাণ্ডার। আর নিঃস্ব গরিব মানুষ ভাবে, সারা বছর আর তো কিছু পাচ্ছি না, ভোটের সময় তবুও কিছু পাচ্ছি। এর অনেক বেশি কিছু যে তাদের পাওয়ার ন্যায্য অধিকার আছে, তারা জানেই না, তাই চাইতেও পারে না। ভাবে— কপাল দোষে গরিব হয়ে জন্মেছি, গরিব হয়েই দুঃখকষ্ট সহ্য করে বাঁচতে হবে। এই যে তৃণমূল ঘোষণা করেছে ৮৫ হাজার টাকা করে প্রত্যেকটি দুর্গাপূজা কমিটিকে দেবে— এটা কি দুর্গার আরাধনার জন্য? আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুজো কমিটি, ক্লাবগুলোকে হাত করা, যাতে সেগুলি ভোট-আরাধনার কাজে লাগে। এই টাকা কী ভাবে ব্যয় হয়, আপনারা জানেন। এই টাকা খরচ করে দুর্গাপূজা উপলক্ষে যুবকদের রকমারি ফুর্তিতে মাতিয়ে দেওয়া হয়। এক দল যুবকও এই সময় মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, সাট্টা খেলা ও আরও নানা নোংরামিতে মেতে ওঠে। এই ভাবে দলীয় স্বার্থে জনগণের টাকার অপচয় হচ্ছে। এদিকে কেন্দ্র টাকা কমানোয় মিড-ডে মিল প্রায় দেওয়াই যাচ্ছে না। অথচ এ নিয়ে রাজ্য সরকারের মাথাব্যথা নেই। ধর্মের নামে এই সমস্ত অধর্মই চলে। বিজেপির রামমন্দিরও তাই। আবার রাহুল গান্ধীর শিবভক্তিও তাই। এদের সমস্ত ভক্তি হচ্ছে ভোটের ভক্তি।

আজ প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণিই ধর্মকে আফিঙের মতো ব্যবহার করছে

আর একটা জিনিস লক্ষ করুন। সারা দেশে এখানে সেখানে স্বঘোষিত 'গডম্যান' তথা 'বাবা'দের আবির্ভাব হচ্ছে। যত্রতত্র ধর্মীয় মেলা, উৎসব, নানা দেব-দেবীর পূজার অনুষ্ঠান বেড়েই চলেছে। একই ভাবে মুসলিমদের মধ্যেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বেড়ে চলেছে। অশিক্ষিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত, শোষিত, অসহায় সাধারণ মানুষ এই দুনিয়ায় ন্যায়বিচার বঞ্চিত হয়ে, কাল্পনিক 'উপরওয়ালার' কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে অথবা সকল দুঃখ-দুর্দশার কারণ হিসাবে পূর্বজন্মের পাপজনিত কর্মফলকে দায়ী করে পরজন্মে 'নিষ্কৃতি' প্রার্থনা করে— এ কথা ঠিক। বৈজ্ঞানিক চেতনায় শিক্ষিত না হলে এ সব বাড়তেই থাকবে। কিন্তু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা এর অবসান চায় না। তারা চায়, জনগণ জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে এই ধর্মীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকুক। তা হলে তারা শত অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-নিপীড়নের জন্য পুঁজিবাদকে, ক্ষমতাসীন দলগুলিকে দায়ী করবে না। দায়ী করবে নিজের 'অদৃষ্ট'কে, মেনে নেবে এটাই 'বিধির বিধান'। তাই সিলেবাসে যতটুকু বিজ্ঞান শিক্ষা ছিল, বিজেপি সেটা বাতিল করে মধ্যযুগীয় বেদ-বেদান্ত, মনুসংহিতা, গীতা এসব আনছে, যার বিরুদ্ধে রামমোহন-বিদ্যাসাগর রেনেসাঁস যুগে লড়াই গড়ে তুলেছিলেন। বিজেপি চায় মানুষের মধ্যে ধর্মান্ধতা বাড়ুক। তা হলে বৈজ্ঞানিক বিচারধারা থাকবে না, যুক্তিবাদী মন থাকবে না, প্রশ্ন করার মন থাকবে না, প্রতিবাদ করার চরিত্র থাকবে না, মানুষে আর পশুতে পার্থক্য থাকবে না। এমন হলে তারা নিশ্চিন্তে শোষণ-শাসন চালাতে পারবে এবং ফ্যাসিবাদের ভিত আরও পাকাপোক্ত করে তুলতে পারবে। এ ছাড়াও তাদের আরও একটি ষড়যন্ত্র আছে যার লক্ষ্য ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় ভেদাভেদ, ধর্মীয় বিদ্বেষ— এ সবে উস্কানি দিয়ে জনগণকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-দাঙ্গায় মাতিয়ে দিয়ে গণআন্দোলনের ঐক্য ভেঙে দেওয়া এবং ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। কংগ্রেস-তৃণমূল, ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি সেকুলারিজমের তকমা

তিনের পাতায় দেখুন

বিজেপি-আরএসএস নবজাগরণের চিন্তাকে ধ্বংস করতে চায়

দুয়ের পাতার পর

লাগিয়ে হিন্দু মন্দিরে যায়, মুসলিমদের মসজিদেও যায়। অথচ যথার্থ সেকুলারিজম বলে, রাজনীতি, শিক্ষা, সরকারি অনুষ্ঠানের সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। এ কথা নেতাজি, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথরা বলে গেছেন। অন্য দিকে বিজেপি সরাসরি 'হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক' তৈরি ও বাড়াবার হীন উদ্দেশ্যে প্রবল মুসলিম-বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছে।

মার্ক্সবাদী হিসাবে নিরীশ্বরবাদী হলেও আমরা প্রথম যুগের ধর্মপ্রচারকদের মহান ভূমিকাকে শ্রদ্ধা করি এবং সেই সময়ে সমাজকল্যাণে ও অগ্রগতিতে ধর্মের প্রগতিশীল ভূমিকাকেও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখি। যেখানে প্রথম যুগের বুর্জোয়া চিন্তাবিদ বেকন, লক, হবস, স্পিনোজারা ধর্মকে 'অ্যাবারেশন অব হিস্ট্রি' বলে অগ্রাহ্য করেছিলেন, সেখানে মার্ক্সের ঐতিহাসিক বক্তব্য ছিল— 'ধর্ম হচ্ছে অত্যাচারিত মানুষের চোখের জল, নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, ধর্ম হৃদয়হীন পৃথিবীতে এনেছে হৃদয়বৃত্তি'। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ধর্ম সমাজে ন্যায়নীতি বোধ, নিয়মশৃঙ্খলা, কর্তব্য-দায়িত্ববোধ এনেছিল। দাসপ্রথার যুগে অত্যাচারী দাসপ্রভুদের বিরুদ্ধে দাসদের মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ধর্মীয় চিন্তা এসেছিল। সেই দিনের ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মপ্রচারকরা দাসপ্রভুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন, অনেকে নিহতও হয়েছেন এবং সেই সংগ্রামের পথেই দাসপ্রথার অবসান ঘটিয়ে ধর্মীয় শাসনভিত্তিক রাজতন্ত্র এসেছে। এই রাজতন্ত্র যখন ধর্মের নামে শোষণ-অত্যাচার চালিয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে লড়াই করেই আধুনিক প্রজাতন্ত্র বা বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি এসেছে।

প্রথম যুগে উদীয়মান প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণি ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করে সেকুলার মানবতাবাদের আদর্শ নিয়ে এসেছিল। আজ প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণিই সাধারণ মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন ও বিপথগামী করার জন্য ধর্মকে আফিংয়ের মতো ব্যবহার করছে। আজ কি কোথাও মন্দির-মসজিদ-গির্জার কোনও ধর্মপ্রচারক, সমাজের এত অন্যায়-অত্যাচার-নিপীড়ন— ধর্মীয় বিচারেও যা অধর্ম বলে গণ্য হয়, তার বিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদ করছেন? একদিকে মন্দিরে পুজো, মসজিদে নমাজ, গির্জায় প্রার্থনা চলছে, অন্য দিকে এখানে-সেখানে শত শত ক্ষুধার্ত নর-নারী-শিশু কাঁদছে, নির্যাতিতা-ধর্ষিতা নারী আর্তনাদ করছে, সেই শব্দ দেবালয়ে পৌঁছয় না! ধর্মীয় অনুষ্ঠানও মূলত কিছু মন্ত্র-স্তোত্র পাঠ ও আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে এবং পুঁজিপতি-ব্যবসাদারদের রাজনৈতিক ব্যাকিং-এ ও তাদের স্বার্থে তা পরিচালিত হচ্ছে। অধিকাংশ মন্দির-মসজিদ-গির্জা এখন বিপুল সম্পদের অধিকারী। অথচ প্রথম যুগের ধর্মপ্রচারকদের অনাহারে কাটাতে হয়েছে।

এ ছাড়া আজকের যুগের কোনও সমস্যা— বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, ট্যাক্সবৃদ্ধি, যানবাহনের ভাড়াবৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্কট, দুর্নীতি ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে বেদ-বেদান্ত-রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-কোরান-বাইবেল— কোথাও কোনও আলোচনা আছে? কেন নেই? কারণ সেই যুগে এইসব সমস্যা দেখা দেয়নি। এই ধর্মীয় গ্রন্থগুলি যখন রচিত হয়েছিল, তখনকার সমস্যা তাতে আলোচিত হয়েছিল।

ধর্মীয় পথে বা অবক্ষয়িত সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে নয়, মার্ক্সবাদের পথেই শোষণমুক্তি সম্ভব

তাই ধর্মীয় পথে নয়, অবক্ষয়িত পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বা সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে নয়, একমাত্র বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্ক্সবাদকে হাতিয়ার করে সমাজ বিপ্লবের পথেই শোষণমুক্তি সম্ভব। মনে রাখা দরকার, শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির স্বার্থে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা— ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বটানি, জিওগ্রাফি ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার আবিষ্কৃত বিভিন্ন নিয়মগুলিকে কো-অর্ডিনেট, কো-রিলেট ও জেনারালাইজ (সমন্বয় করে, পারস্পরিক সম্পর্কগুলি বুঝে ও সাধারণীকৃত) করেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্ক্সবাদ এসেছে। ফলে জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই যেমন বিজ্ঞানের পরীক্ষিত ও প্রমাণিত আবিষ্কারকে অস্বীকার করা চলে না, তেমনই মার্ক্সবাদকেও অস্বীকার করা চলে না। মার্ক্সবাদই প্রথম দেখিয়েছে, কোন নিয়মে আদিম সমাজ থেকে দাসপ্রথা, তারপর সামন্ততন্ত্র, তারও পরে পুঁজিবাদ এসেছে এবং একই নিয়মে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ আসবে। এ সব পরিবর্তন অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই নিয়ম বর্হিভূত আকস্মিক ঘটনা নয়।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার জনগণকে বলে গেছেন যে, মার্ক্সবাদ বুঝতে হবে। মার্ক্সবাদী বিচার অনুযায়ী তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষ আজ এক জাতি, এক জনগণ, এক দেশ হয়ে নেই। ভারতবর্ষ আজ শ্রেণিবিভক্ত। একদিকে মুষ্টিমেয় ধনী শোষক শ্রেণি, একচেটিয়া পুঁজিপতি, অন্য দিকে অগণিত নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষ, শোষিত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণ। এই দুই শ্রেণিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত। দুই শ্রেণির রাজনীতিও আলাদা। শোষক ও শোষিত শ্রেণির রাজনীতি, একটি আরেকটির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাই বুঝতে হবে— কে কোন শ্রেণির রাজনীতি করে, কোনটা কোন শ্রেণির দল। কোনও দল কি ভোটের সময় বলবে, আমি পুঁজিপতি শ্রেণির হয়ে কাজ করব? এরা সবাই নানা ভেক ধরে আসে, আর বলে, আর কিছু চাই না— একবার আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন। আর এই 'সেবা-ই' দীর্ঘদিন ধরে চলছে। তাতেই আজ দেশের এই হাল হয়েছে। দুর্গতি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এগুলো না বুঝে সাধারণ মানুষ বারবার ঠকছেন।

জনগণকে রাজনীতি বুঝতে হবে

এই সব শাসক দলগুলি নানা প্রতিশ্রুতি দেয়, গালভরা মিথ্যা কথা বলে। এ বলে ও চোর, ও বলে সে চোর। এ বলে ও দুর্নীতিগ্রস্ত, সে বলে ও দুর্নীতিগ্রস্ত— এ ভাবেই দুর্নীতিগ্রস্তদের লড়াই চলে। মানুষ বুঝতে পারে না— এই দলগুলি শোষক শ্রেণির দল, নাকি শোষিত জনগণের দল। আসলে এরা সবাই চুরি করে, সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। এই জন্য আমাদের দেশের মানুষ বারবার ঠকছে। স্বদেশি আন্দোলনে গান্ধীজির সাথে নেতাজির কী পার্থক্য ছিল— জনগণ বুঝতে পারেনি। সেই যুগে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, গান্ধীজির ভয় বিপ্লবকে, সমাজতন্ত্রকে। বিপ্লবভীত পুঁজিপতিরা গান্ধীজির পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে জন্য গান্ধীবাদীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে বিপ্লববাদে বিশ্বাসী নেতাজিকে কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। কার রাজনীতি কী, কে ঠিক— সে দিন এসব নিয়ে সাধারণ মানুষ মাথা ঘামায়নি। তার ফল যা হওয়ার হয়েছে, গান্ধীজিকে সামনে রেখে পুঁজিপতিরা ক্ষমতা দখল করেছে।

আপনাদের এ কথা বলতে চাই যে, রাজনীতির বাইরে আপনারা কেউ নেই। যা কিছু বাজার থেকে আপনারা কেনেন— নুন, তেল, কাপড়, চাল, ডাল— রাজনীতিই ঠিক করে সেগুলির দাম কী হবে, রাজনীতিই ঠিক করে স্কুল-কলেজে কী পড়া হবে। রাজনীতিই ঠিক করে হাসপাতালে চিকিৎসা কী রকম হবে। রাজনীতিই ঠিক করে চাকরি পাবেন কি পাবেন না, রাজনীতিই ঠিক করে মজুরি কী হবে না হবে। রাজনীতির বাইরে কোনও জীবন নেই। জন্মের সময় সার্টিফিকেট নিতে হয়, মৃত্যুর সময়ও সার্টিফিকেট নিতে হয়— এ সবই রাজনীতির সাথে বাঁধা। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হয় আইন মেনে চলতে হয়, না হলে আইন ভঙ্গ করতে হয়। এগুলো সবই রাজনৈতিক বিষয়। ফলে রাজনীতির বাইরে কেউ নেই। সে জন্য রাজনীতি বুঝতে হবে। আর রাজনীতি বুঝতে হলে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা বুঝতে হবে। এই চিন্তাধারার ভিত্তিতেই বিচার করতে হবে, বুঝতে হবে— কোন দল শ্রমিক শ্রেণির দল, সর্বহারা শ্রেণির দল, শোষিত জনগণের দল, আর কোন দল বুর্জোয়া শ্রেণির দল।

বিজেপি-আরএসএস নবজাগরণের চিন্তাকে ধ্বংস করতে চায়

আপনাদের বলতে চাই, আমাদের দেশে নবজাগরণের যুগে রামমোহন রায় বলেছিলেন, যে সংস্কৃত শিক্ষা দু'হাজার বছর ধরে দেশের মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখেছে, সেই সংস্কৃত শিক্ষা চাই না। বলেছিলেন, বেদান্ত বাস্তব জগতকে অস্বীকার করে, এই বেদান্ত শিক্ষার দ্বারা আধুনিক নাগরিক গড়ে উঠবে না। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষের নাগরিকদের গড়ে তুলতে হলে চাই প্রাকৃতিক দর্শন, কেমিস্ট্রি, অ্যানাটমি, অঙ্কশাস্ত্র। যে বিদ্যাসাগরের পায়ে সকলে মাথা নত করেছে, সেই বিদ্যাসাগর আরও এগিয়ে বললেন, বেদান্ত ও সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন। ইউরোপ থেকে এমন দর্শন পড়ানো দরকার যাতে ভারতবর্ষের লোক বুঝবে— বেদ-বেদান্ত-সাংখ্য মিথ্যা। বললেন, চাই বৈজ্ঞানিক চিন্তা, চাই যুক্তিবাদী মনন। যার মধ্যে দিয়ে এগুলি গড়ে উঠবে তেমন ধরনের শিক্ষা চাই। তিনি বলেছেন, আমাদের দেশের পণ্ডিতরা, শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্কপ্রসূত যা কিছু— সবই অভ্রান্ত, বেদবাক্য, এর কখনও অন্যথা হতে পারে না। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। রামকৃষ্ণ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর যাননি। মহারাষ্ট্রের জ্যোতিরাও ফুলে নবজাগরণের চিন্তার আর একজন প্রবর্তক। তিনি বলেছেন, মন্দিরে যে ঘণ্টা বাজে তার আহ্বান হচ্ছে ধর্ম, কুসংস্কার এবং মূর্খামির। আর বিদ্যায়তনের ঘণ্টা মানেই হচ্ছে যুক্তিবাদী মনন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। তোমরা কোনটা বেছে নেবে? এঁরাই নবজাগরণের পথপ্রদর্শক।

আরএসএস স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী ছিল

আজ বিজেপি-আরএসএস নবজাগরণের চিন্তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই আরএসএস-হিন্দু মহাসভা, যেখান থেকে বিজেপির জন্ম, তারা গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল। আরএসএসের গুরু গোলওয়ালকর লিখেছেন, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং ব্রিটিশের বিরোধিতাভিত্তিক এই যে জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ— এটা হিন্দুত্বভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রেরণা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করছে। এটা প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা। বলেছেন, ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করে দেখা হয়েছে। বলছেন, তারাই দেশপ্রেমিক যারা হিন্দু জাতীয়তার প্রেরণা নিয়ে চলে, সেই লক্ষ্যে কাজ করে এবং যারা তা করছে না, তারা বিশ্বাসঘাতক, তারা দেশের শত্রু। তা হলে এই বিচারে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, বীর শহিদেরা বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু ছিলেন, কারণ তাঁরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্লোগানের বিরোধিতা করেছিলেন! এটা জনগণ মানতে পারে? '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে আরএসএস-হিন্দু মহাসভা অংশগ্রহণ করেনি। ভারতের সীমান্তে আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে তখন আরএসএস, হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের বলছে— ব্রিটিশ আর্মিতে যোগ দাও। গোটা স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে এই আরএসএস-জনসংঘ, যার থেকেই জন্ম বিজেপির। আজ তারা দেশাত্মবোধের জিগির তুলছে!

পশ্চিমবাংলায় যাঁরা আরএসএস আর বিজেপির ঝান্ডা বহন করেন, তাঁরা কি নেতাজিকে মানেন? তাঁরা কি স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরব অনুভব করেন? তাঁরা কি রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা করেন? তাঁরা নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করুন— দেশকে তাঁরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? এই নির্বাচনে বিজেপি চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর যে নজির রাখল, তা আপনারা দেখেছেন।

আমি বলতে চাই— বিবেকানন্দ হলেন সর্বশেষ মানুষ, যিনি ধর্মপ্রচারক হিসাবে সৎ ও বড় মানুষ ছিলেন। বিবেকানন্দের পর আর কোনও

পাঁচের পাতায় দেখুন

জাস্টিস ফর আর জি কর

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে ২০ আগস্ট মেদিনীপুর শহরে শতাধিক গ্রামীণ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী মিছিল করলেন। শহরের বার্জ টাউন থেকে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই মিছিল করে তাঁরা প্রথমে জেলাশাসক দপ্তর, পরে সিএমওএইচ দপ্তরে পৌঁছান। সেখানে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট (ফিমেল), কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, কমিউনিটি হেলথ অফিসার, হেলথ সুপারভাইজার (ফিমেল) এবং পাবলিক হেলথ নার্সদের মধ্য থেকে নির্বাচিত চারজনের প্রতিনিধি দল সিএমওএইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেন। তাঁরা দাবি করেন, আর জি কর ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সমস্ত স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আশাকর্মীদের যে সমস্ত হেলথ সেন্টারে রাতে থাকতে হয়, সেখানে সুরক্ষার দাবি জানান তাঁরা।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে ২২ আগস্ট রঙ ও তুলির মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানালেন মেছেদার শিল্পীরা। নন্দলাল বসু মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রছাত্রী 'শিল্প ভাষা' সংস্থা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আর্টিস্ট ফোরামের উদ্যোগে ছিল এই কর্মসূচি। চিত্রশিল্পী, আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন কলেজের আর্টের অধ্যাপকেরা এই কর্মসূচিতে ছবি এঁকে, গান এবং বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন।

ডায়মন্ডহারবারে স্কিম ওয়ার্কারদের প্রতিবাদ। ১৯ আগস্ট

রঙ-তুলিতে শিল্পীদের প্রতিবাদ। পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদা, ২২ আগস্ট

বাঁকুড়া ঃ আর জি করের নারকীয় ঘটনার বিচার চেয়ে এবং মূল দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাঁকুড়ায় ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী আইনজীবী বুদ্ধিজীবীসহ সহস্রাধিক মানুষের মিছিল হয়। মিছিলটি মাচানতলা আকাশ মুক্তমঞ্চ থেকে শুরু হয়ে রানিগঞ্জ মোড় ঘুরে আবার মাচানতলায় এসে শেষ হয়। মিছিলে ডাঃ নীলাঞ্জন কুণ্ডু, ডাঃ জীতেন ব্যানার্জী, ডাঃ সজল বিশ্বাস, নাট্যকার নদিয়া ইন্দু বিশ্বাস, শিক্ষক রঞ্জিত মাহাতো, সরকারিকর্মী বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষ পা মেলান। মিছিলে চলতে চলতেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ছবিতে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পীরা। সমস্ত দোষীদের বিচার চেয়ে হাজারো কণ্ঠের স্লোগানে মিছিলটি মুখরিত হয়ে ওঠে।

উত্তর ২৪ পরগণার আগরপাড়ায় মৌনমিছিল। ২৫ আগস্ট

হাওড়া ঃ আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে ২০ আগস্ট নারী-নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির ডাকে হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক সভা। বক্তব্য রাখেন হাওড়া হাসপাতালের ডাঃ অগ্নিবীণ কুণ্ডু, হাওড়া কোর্টের আইনজীবী আবরার আহমেদ, অধ্যাপক সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়, সেভ এডুকেশন কমিটি হাওড়া জেলা সম্পাদক শিক্ষক চণ্ডীচরণ মাইতি, সমাজসেবী আনিসুল করিম, বাচিক শিল্পী দীনেশ মান্না সহ সমাজের বিশিষ্ট মানুষেরা। সভা শেষে হাওড়া ময়দান থেকে মল্লিক ফটক পর্যন্ত দুই শতাধিক মানুষের মোমবাতি মিছিল হয়।

বাঁকুড়ায় চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবী সহ সহস্রাধিক মানুষের মিছিল

হুগলির সোমড়াবাজারে ক্রীড়াপ্রেমীদের প্রতিবাদ। ২৫ আগস্ট

হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত নাগরিক সভায় বক্তব্য রাখছেন হাওড়া হাসপাতালের চিকিৎসক অগ্নিবীণ কুণ্ডু

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্রাকচুয়াল) ইউনিয়ন-এর দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১০ আগস্ট, কলকাতার আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে। পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, বাজারদর অনুযায়ী পারিশ্রমিক বৃদ্ধি, কাজের চাপ কমানো, মাতৃত্বকালীন ছুটি সহ সকল সরকারি ছুটি, পিএফ-গ্র্যাচুইটি সহ সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলন শক্তিশালী করার আহ্বান ওঠে সম্মেলনে। সম্মেলন থেকে কেকা পাল ও পৌলমী করঞ্জাইকে যুগ্ম সম্পাদিকা এবং রুনা পুরকাইতকে সভাপতি করে ১৩০ জনের কমিটি গঠিত হয়।

গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ সিপিডিআরএস-এর

প্রতিবাদ করার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার সরকারি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ২৫ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন,

দেশের সর্বস্তরের মানুষ যখন বিবেক-যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত, প্রতিকার চাইতে পথে নেমেছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানুষের প্রতিবাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য আন্দোলনকারীদের ভয় দেখাচ্ছে, লাঠিপেটা করে জেলে পুরছে। অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল করার অপরাধে জলপাইগুড়ি জেলায় ২২ জন আন্দোলনকারীকে আজও জেলে রেখে দিয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের যে কোনও রকম জমায়েত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। স্কুলছাত্ররা শিক্ষা দপ্তরের কর্মসূচি ছাড়া অন্য কোনও কর্মসূচিতে যাতে অংশগ্রহণ না করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ জেলাশাসকদের দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

আমরা মনে করি, প্রতিবাদ করার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। একে কেড়ে নেওয়া যায় না। আমরা অবিলম্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী সরকারি ফতোয়া প্রত্যাহার করা এবং আন্দোলনকারীদের ওপর থেকে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

প্রকৃত মার্ক্সবাদীরা কখনও অন্ধতা নিয়ে চলে না

তিনের পাতার পর

সৎ ধর্মপ্রচারক নেই, আসতেও পারে না। বিবেকানন্দ বেদান্তে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু বিবেকানন্দের যে বলিষ্ঠতা তা বেদান্তের শক্তিতে নয়, তাঁর বলিষ্ঠতা দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের শক্তিতে গড়ে উঠেছিল। তিনি সে যুগের যুবশক্তিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আহ্বান করেছিলেন। আপনারা অনেকেই জানেন না, বিবেকানন্দের যোগ্য শিষ্য বলে পরিচিত ভগিনী নিবেদিতা সশস্ত্র

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে ৫ আগস্টের সভামঞ্চ

বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের সাহায্য করেছিলেন— যার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তিনি। এই বিবেকানন্দকে কি আরএসএস-বিজেপি মানে? বিবেকানন্দ বলেছেন, আমরা সব ধর্মকে সমর্থন করি এবং শ্রদ্ধা করি। তিনি বলছেন, আমরা মানবজাতিকে এমন পরিবেশে নিয়ে যেতে চাই যেখানে গীতা থাকবে না, বাইবেল থাকবে না, কোরান থাকবে না, সব কিছু মিলে এক হবে। বিবেকানন্দ বলছেন, কোনও ধর্ম অন্যদের উপর অত্যাচার করতে শেখায়নি, কোনও ধর্ম অন্যায়কে সমর্থন করেনি। তা হলে মানুষকে উত্তেজিত করছে কে? ধর্ম নয়, তাদের উত্তেজিত করছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। আমি বিবেকানন্দকে উদ্ধৃত করেই কথাটা বললাম। মতপার্থক্য থাকলেও এই বিবেকানন্দকে আমরা শ্রদ্ধা করি। এই বিবেকানন্দ এমন কথাও বলেছেন যে, রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে শিক্ষা নিতে হলে, রাম আর কৃষ্ণ ছিল কি ছিল না, এটা কোনও প্রশ্ন হতে পারে না। বিবেকানন্দ বলেছেন, আমার ছেলে থাকলে তাকে আমি এক পংক্তি মন্ত্র ছাড়া কোনও ধর্ম-শিক্ষা দিতাম না। তারপর সে বড় হয়ে খ্রিস্টান হতে পারে, আমার স্ত্রী বৌদ্ধ হতে পারে, আমি মুসলমান হতে পারি, তাতে কী ক্ষতি! তা হলে বিবেকানন্দ কি হিন্দু ধর্ম মানতেন না! এই বিবেকানন্দকে মানলে বিজেপিকে মানা যায় কি! বিজেপি বলছে ওরা নাকি রামের জন্মস্থান উদ্ধার করেছে। আমরা বলেছি, বাল্মিকীর রামায়ণে কোথাও কি আছে যে ওই জায়গাতেই রামের জন্ম? তুলসীদাসের রামায়ণে কি লেখা আছে— রামের জন্মস্থান ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ হয়েছে? অথচ এই ধুয়া তুলে ভোট করে বিজেপি। এরা তো মানুষকে ঠকাচ্ছে!

সিপিএম মার্ক্সবাদের নামে কর্মীদের ভুল বুঝিয়েছে, জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে

এখন আর একটা বিষয়ে বলছি। খবরের কাগজে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, সিপিএম নেতারা চিন্তিত— কেন তাঁদের ভোট কমছে! তাঁরা নাকি জনগণের থেকে মতামত সংগ্রহ করছেন! এর জন্য জনগণের মতামত সংগ্রহের দরকার কী? তাঁরা কি জানেন না, ৩৪ বছর ধরে বামপন্থাকে কলঙ্কিত করে কী ধরনের শাসন তাঁরা করেছেন? যে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী হিসাবে একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল— এখানে বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল গড়ে উঠেছিল, এখানেই নেতাজির অভ্যুত্থান ঘটেছিল। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ভিত্তি করে এখানে বামপন্থা শক্তিশালী হয়েছিল। সেই বামপন্থাকে আত্মসাৎ করে প্রথমে সিপিআই, পরে সিপিআই(এম) শক্তি সঞ্চয় করেছিল এবং তার ভিত্তিতে ৩৪ বছর তারা শাসন চালিয়েছে। সেই শাসন কী ধরনের শাসন ছিল? তারা শ্রমিকের উপর গুলি চালিয়েছে, কৃষকের ওপর গুলি চালিয়েছে। তারা সিন্ডিকেটের রাজত্ব, প্রোমোটারি রাজত্ব, কন্ট্রাক্টরের রাজত্ব, তোলাবাজি, কাটমানির রাজত্ব কায়েম করেছে। তাদের প্রবীণ নেতা বিনয় চৌধুরী মন্ত্রিত্বে থাকাকালীনই বলেছেন, রাজ্যে প্রোমোটারি-কন্ট্রাক্টারির রাজত্ব চলছে। শুনে জ্যোতিবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, এমন সরকারে আছেন কেন? পদত্যাগ করুন। তাঁকে পদত্যাগ করতে হল। সে সময় থানা পুলিশ সিপিএমের হুকুমে চলত। ইউনিভার্সিটির উপাচার্য, কলেজের অধ্যক্ষ কে হবেন, কোন স্কুলে কে শিক্ষক হবেন, এমনকি পাড়ায় কে কোন বাড়ি কিনবে, বিক্রি করবে, কার সাথে কার বিয়ে হবে— সবই সিপিএম নেতারাই ঠিক করতেন। এই শাসনে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়েছিল, যাকে ভিত্তি করে তৃণমূলের অভ্যুত্থান। সেই সময় তৃণমূল নেত্রীকে খবরের কাগজ 'অগ্নিকন্যা' বলে ব্যাপক প্রচার দিয়েছিল। তারা আজ কী বলবে জানি না।

সিপিএম নেতারা কি কখনও বলেছেন— আমাদের ৩৪ বছরের রাজত্বে আমরা এই এই ভুল করেছি? সব দোষ কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন। মহান লেনিন বলেছেন, প্রকৃত কমিউনিস্ট যারা, তারা প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করে, ভুলের কারণ নির্ধারণ করে এবং তা থেকে নিজেদের সংশোধন করে। সে সাহস সিপিএম নেতাদের আছে? নেই। কারণ তাঁরা কোনও দিন কমিউনিজমের চর্চা, মার্ক্সবাদের চর্চা করেননি। তাঁরা মার্ক্সবাদের নামে, কমিউনিজমের নামে কর্মীদের ভুল বুঝিয়েছেন, জনগণকে বিভ্রান্ত করেছেন। গত পার্লামেন্ট ভোটে 'আগে রাম, পরে বাম'— বুঝিয়েছেন। যার ফলে সমর্থকদের একাংশ আজও বিজেপির ছত্রছায়ায় রয়েছে। ফলেই আজ তাঁদের এই পরিণতি। আজ সিপিএমকে পার্লামেন্টে দু-চারটে সিট পাওয়ার জন্য কংগ্রেস ও আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির লেজুড়বৃত্তি করে চলতে হচ্ছে। অথচ অতীতে লোকসভায় অবিভক্ত সিপিআই ছিল প্রধান বিরোধী দল।

স্মরণদিবসের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

মার্ক্সবাদীরা কখনও অন্ধতা নিয়ে চলে না

এখানে সিপিএমের কর্মী-সমর্থক যদি কেউ থাকেন, তাঁদের বিষয়টি ভেবে দেখতে বলব। তাঁদের প্রতি আমাদের কোনও বিদ্বেষ নেই। কিন্তু তাঁরা নিজেরা অন্ধতামুক্ত হোন। মার্ক্সবাদীরা কখনও অন্ধতা নিয়ে চলে না। তারা মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে নেতৃত্ব ঠিক কি ভুল বিচার করে, নীতি ঠিক কি ভুল বিচার করে। লেনিনের শিক্ষক ছিলেন কাউটস্কি, প্লেখানভ, যাঁদের কাছ থেকে তিনি মার্ক্সবাদ শিখেছেন। তাঁরা যখন বিপথগামী হলেন, লেনিন তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তুললেন। আরএসডিএলপি-কে ভেঙে মার্ক্সবাদের সঠিক প্রয়োগের ভিত্তিতে আলাদা বলশেভিক পার্টি গড়ে তুললেন রাশিয়ার বুকে।

আমরা সিপিএমের বিরুদ্ধে কোনও বিদ্বেষ নিয়ে চলি না। আমরা চাই সিপিএম নেতৃত্ব তাদের ভুল সংশোধন করুক। তারা জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে বলুক— তারা ভুল করেছে। নন্দীগ্রামে সিপিএম শুধু গণহত্যা করেনি, পুলিশ দিয়ে, অ্যান্টিসোসাল দিয়ে গণধর্ষণ পর্যন্ত করিয়েছে। এগুলো মানুষ ভুলতে পারে না। তাই আমার বক্তব্য, কোনও দলকেই অন্ধের মতো অনুসরণ করবেন না। আপনারা তো একদিন কমিউনিজমের আকর্ষণেই সিপিএম দলে যুক্ত হয়েছিলেন। এখন কি বিচার করবেন না, দল কোন পথে চলেছে?

এমনকি আমাদের দলকেও অন্ধের মতো মানবেন না। এখানে আমাদের অনেক কর্মী আছেন, সমর্থক আছেন, সাধারণ মানুষ আছেন। তাঁদেরও বলব, আমরা ঠিক পথে চলছি কি না, শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী চলছি কি না, আমাদের আচার-আচরণ, কর্মপন্থা, আমাদের চরিত্র, আমাদের ব্যবহার শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী হচ্ছে কি না— এগুলি আপনাদের বিচার করতে হবে। এ না হলে আমাদের দলেও সঙ্কট আসবে। আবারও বলছি, জনগণ ঠকবে না, যদি রাজনীতির চর্চা করে, রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়। পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে এবং মজদুরদের মহল্লায় মহল্লায় আপনারা সাধারণ মানুষকে নিয়ে কমিটি গড়ে তুলুন, রাজনীতির চর্চা করুন। কোন দল ঠিক, কোন দল বেঠিক বিচার করুন। তার ভিত্তিতে আন্দোলনের প্রয়োজন যখন হবে এই পাবলিক কমিটির নেতৃত্বে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে আন্দোলনে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এই যে বাংলাদেশে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে, আজও লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নেমেছে, একটু আগে খবর এসেছে— জনগণের দাবিতে ওখানকার প্রধানমন্ত্রী

ছয়ের পাতায় দেখুন

নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সমাজতন্ত্র

একের পাতার পর

শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। মিলিটারি ক্ষমতা নিতে চেয়েছিল। জনগণ বলেছে, মিলিটারি শাসন নয়, অন্তর্বর্তী সরকার চাই। এখন আলোচনা চলছে। একটা গণআন্দোলনের শক্তি কী করতে পারে, বাংলাদেশ তা দেখিয়ে দিল। যেখান থেকে আপনাদেরও শিক্ষা নেওয়ার আছে।

পুঁজিবাদের কোনও মানবিকতা-নৈতিকতা নেই

আর একটি বিপজ্জনক বিষয় সম্পর্কে বলতে চাই। এ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি ও সরকারি দলগুলি ছাত্র-যুবকদের নীতি-নৈতিকতা-মনুষ্যত্ব ধ্বংস করছে। আমাদের দেশের অবস্থা কী? বহুদিন আগে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ভারতবর্ষের পুঁজিপতি শ্রেণি এবং সেই শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে এইসব দলগুলো ছাত্র-যুবকদের মনুষ্যত্ব-বিবেক-নৈতিক বল ধ্বংস করে দিচ্ছে। গোটা দেশে আজ আপনারা দেখছেন এক ভয়ঙ্কর চিত্র! মদ, জুয়া, সাট্টা, ড্রাগ-অ্যাডিকশন— যুব সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ তার মধ্যে নিমজ্জিত। নোংরা সিনেমা, টিভি, মোবাইলের মাধ্যমে নোংরা ছবি— এ সব কিছুর প্রভাবে ছাত্র-যুব সমাজের নৈতিক মান নামছে। এই যে নারীধর্ষণ হচ্ছে, গণধর্ষণ হচ্ছে, এ সব রামমোহন-বিদ্যাসাগররা-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুলরা দেখে যাননি। স্বদেশি আন্দোলনের নেতারাও দেখে যাননি। এই মুহূর্তে হয়তো কয়েকশো ধর্ষিতা নারী আর্তনাদ করছে। আপনারা ভাবতে পারেন— এক কিশোর নোংরা ছবি দেখে শিশু-বোনকে ধর্ষণ করেছে এবং তারপর তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে! আপনারা ভাবতে পারেন, বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করছে! আপনারা ভাবতে পারেন, অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের তথাকথিত প্রেম, তারা একত্রে রাত্রিবাস করবে, মা আপত্তি করেছে বলে মাকে খুন করে দিল! এই পশ্চিমবাংলায় ঘটেছে এ ঘটনা। এ সব ঘটছে কিসের প্রভাবে? এই কি দেশের অগ্রগতি? এই কি দেশের উন্নয়ন? দিল্লিতে যাঁরা গদিতে বসে আছেন, রাজ্যে রাজ্যে যাঁরা গদিতে বসে আছেন— কী কৈফিয়ৎ তাঁরা দেবেন? দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা? এমনকি মা ধর্ষণের অভিযোগ করছে ছেলের বিরুদ্ধে! আলিপুর কোর্টে সেই মামলা চলছে। এই কি সভ্যতা? আসলে এই হচ্ছে পুঁজিবাদ, মানবজাতির চরম শত্রু— যা মনুষ্যত্ব-বিবেক-নৈতিকতা সব কিছুকে ধ্বংস করছে। পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ-অবিশ্বাসের বিষবাষ্পে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সমস্ত ধরনের স্নেহ মায়া মমতার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সন্তান বৃদ্ধ বাবা-মাকে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে, সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে খুন করে দিচ্ছে। এই পুঁজিবাদ কোটি কোটি মানুষের রক্ত শোষণ করে সম্পদের ভাণ্ডার বাড়াচ্ছে। তাতে মানুষ মরল কি বাঁচল, শ্রমিক মরল কি বাঁচল কোনও পরোয়া নেই। এই পুঁজিবাদের কোনও মানবিকতা নেই, কোনও নৈতিকতা নেই। এই পুঁজিবাদই দেশের মানবিকতা-নৈতিকতাকে ধ্বংস করছে, মনুষ্যত্ব ধ্বংস করছে, বিবেক ধ্বংস করছে।

পুঁজিবাদ প্রকৃতিকেও ধ্বংস করছে

অন্য দিকে তাকিয়ে দেখুন— কেরালায় যে ধ্বংসকাণ্ড হল, হিমাচলে, উত্তরাখণ্ডে ভূমিধস হল, এত লোক মারা গেল, এ সব কিসের জন্য ঘটল? পুঁজিপতিরা, বৃহৎ ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞানীদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে সেখানে যথেচ্ছ টুরিস্ট লজ করেছে, হোটেল তৈরি করেছে, প্রমোদের ব্যবস্থা করেছে, বিরাট বিরাট বাড়ি করেছে, পাহাড় ভেঙেছে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প করেছে, মাটি খুঁড়ে খনিজ পদার্থ তুলেছে, বনাঞ্চল ধ্বংস করেছে— এর ফলে এ সব ঘটছে। গোটা পৃথিবীতেই পুঁজিপতিরা এই কাজ করছে। এর ফলে দুনিয়া জুড়ে ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এখন গ্লোবাল বার্নিং-এর দিকে চলে গেছে। গত গ্রীষ্মে আপনারা দেখলেন দুনিয়ার কী হাল হল! আগামী গ্রীষ্মে দেখবেন আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্রের জল বাড়ছে, জল উত্তপ্ত হচ্ছে, আবার হিমালয়ের হিমবাহও গলে যাচ্ছে। ফলে একসময় বড় বড় নদীগুলিও জল পাবে না— এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। সমুদ্রে জলের উচ্চতা বাড়ছে, সমুদ্র ক্রমশ এগিয়ে স্থলভাগকে গ্রাস করছে। কেন হচ্ছে? কারণ ফসিল জ্বালানি কয়লা-পেট্রল-ডিজেল থেকে নিঃসৃত কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে। বারবার বিজ্ঞানীরা ওয়ার্নিং দিচ্ছেন, কিন্তু পুঁজিপতিরা, তাদের তাঁবেদার সরকার শুনছে না, তাদের মুনাফা চাই। তার জন্য বিশ্ব ধ্বংস হোক, তাতে তাদের কোনও পরোয়া নেই। এই হচ্ছে পুঁজিবাদ— মানবজাতির চরম শত্রু।

নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সমাজতন্ত্র

এই পুঁজিবাদকেই ধ্বংস করার আহ্বান জানিয়েছিলেন মহান মার্ক্স-এঙ্গেলস, সেই পথ বেয়েই এসেছেন মহান লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-শিবদাস ঘোষ। আপনারা জানেন এই মার্ক্সবাদকে প্রয়োগ করেই লেনিন মানব ইতিহাসে নতুন সভ্যতা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে। যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে বেকারত্ব বলে কিছু ছিল না, বরং সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করেছিল— কাজ না করলে খাবার জুটবে না। প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কোনও খরচ লাগত না, চিকিৎসার জন্য কোনও খরচ লাগত না। সোভিয়েত ইউনিয়নে জ্বালানি, জল ফ্রি ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারি দোকানে নির্দিষ্ট করা স্বল্পমূল্যেই সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পেত। সেখানে কাজের সময় আট ঘন্টা থেকে কমিয়ে ৭ ঘণ্টা করা হয়েছিল। তারপর সেই সময় আরও কমিয়ে ৬ ঘণ্টার দিকে যাচ্ছিল। সেখানে শ্রমিকদের জন্য সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ে বছরে সবেতন ১৫ দিন ছুটি কাটানোর ব্যবস্থা ছিল। সেখানে শিক্ষক-অধ্যাপক-বিজ্ঞানী-ডাক্তার-উকিল কারও সাহায্য নিতে গেলে মানুষকে আলাদা করে পারিশ্রমিক দিতে হত না, রাষ্ট্রই সবার সমস্ত দায়িত্ব পালন করত। সোভিয়েত ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞানে, সাধারণ বিজ্ঞানে বিশাল অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। সেখানকার ১৬ জন বিজ্ঞানী বুর্জোয়া জগৎ থেকেও নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন অলিম্পিকে শীর্ষস্থানে থাকত। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম মহাকাশে মানুষ পাঠায়। এই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি। এই সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখেই রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে বলেছিলেন, রাশিয়ায় না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে মানবজাতির এক ঐতিহাসিক যজ্ঞ হচ্ছে। নতুন সভ্যতা গড়ে উঠছে। ফরাসি বিপ্লব যে সাম্য-মৈত্রীকে রূপায়িত করতে পারেনি, সোভিয়েত ইউনিয়নে সেটাই কার্যকরী হচ্ছে। ১৯৩৪ সালে তিনি কবি অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, সভ্যতার তপোভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমার আশা ও আনন্দের স্থায়ী কারণ। বলেছিলেন, '...জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব— এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান।...নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড় মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। রবীন্দ্রনাথের অপারেশন হবে। তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ খোঁজ নিচ্ছেন সোভিয়েতের লাল ফৌজ কতটা এগোল? যে দিন অপারেশন হচ্ছে সে দিন শুনলেন লাল ফৌজ এগিয়েছে। আনন্দের সাথে বললেন, ওরাই পারবে। ইতিহাস হল, স্ট্যালিনের নেতৃত্বে লাল ফৌজ ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে পরাস্ত করেছিল, ফ্যাসিস্ট ইটালিকে পরাস্ত করেছিল, মানবজাতিকে রক্ষা করেছিল।

এই সোভিয়েত ইউনিয়নকেই নেতাজি বলেছিলেন— নতুন সভ্যতা, শ্রমিক সভ্যতা, শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র। বলেছিলেন, ওরা শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। নেতাজি বলেছিলেন, বিশ্বে এখন দুটি স্রোত— একটা সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ, আর একটা সমাজতন্ত্র। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের অর্থ বিশ্বে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা। যুদ্ধে আইএনএ বাহিনী যখন পরাস্ত, তখন নেতাজি বললেন, এখনও স্ট্যালিন বেঁচে আছেন এবং স্ট্যালিন গোটা বিশ্বকে পথ দেখাবেন। শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, সুব্রহ্মনিয়াম ভারতী সকলেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ইউরোপের বরেণ্য মনীষী রমাঁ রল্যাঁ, বানার্ড শ, আইনস্টাইন এই নতুন সভ্যতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই হল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি মনীষীদের মনোভাব। আজ যে বুদ্ধিজীবীরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন, তাঁরা এই মনীষীদের সম্পর্কে কি বলবেন— এঁরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন?

সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয় সাময়িক

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পর চিন বিপ্লব, পূর্ব ইউরোপে বিপ্লব, ভিয়েতনামে বিপ্লব— ক্রমে একটা সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সভ্যতাকে ধ্বংস করল সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ। মার্ক্স বহুদিন আগে বলেছিলেন, বিপ্লব হলেই যে সমাজতন্ত্র টিকবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই। মার্ক্স আরও বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র হয় কমিউনিজমের দিকে যাবে, না হলে আবার পুঁজিবাদ ফিরে আসবে। এই সমাজতন্ত্রকে কমিউনিজমের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বহারার একনায়কতন্ত্র চাই। আর বলেছিলেন, যতক্ষণ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে, ততক্ষণ বুর্জোয়া অধিকারবোধের মানসিকতা থাকবে। ফলে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত পুঁজিবাদের শক্তি থেকে যাবে। আর কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক ব্যক্তিবাদ, যেটা আমাদের দেশে আমরা এখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা হিসাবে দেখছি, যার জন্য সন্তান বাবা-মাকে দেখছে না, ভাই দেখছে না বোনকে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম— এটাই হয়ে গেছে মূল মন্ত্র। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে কিন্তু এই ব্যক্তিবাদের প্রগতিশীল রূপ ছিল— আগে স্বাধীনতা, তারপর আমার নিজের স্বার্থ। কিন্তু পরবর্তীকালে পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ায় ব্যক্তিবাদ সুবিধাবাদে পর্যবসিত হয়েছে। রাশিয়া ও চীন বিপ্লবে ব্যক্তিবাদ আমাদের দেশের স্বদেশি আন্দোলনের মতোই আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিনে সমাজতন্ত্রের বহু অগ্রগতি সত্ত্বেও পরবর্তীকালে এই ব্যক্তিবাদ 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' হিসাবে মাথা তোলে, যা সমাজ অগ্রগতির পথে বাধা হিসাবে কাজ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে ও চিনে এই 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদে'র বিরুদ্ধে লড়াই হয়নি। ফলে সেখানে ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও উপরিকাঠামোয়, অর্থাৎ সমাজমননে ব্যক্তিবাদ, সম্পত্তির মালিকানাবোধ থেকে গিয়েছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, এর বিরুদ্ধে লড়াই না হলে এই ব্যক্তিবাদ আক্রমণ করবে সমাজতন্ত্রকে এবং সেটাই ঘটেছে।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে বলেই কি সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই? তা হলে কি এই পুঁজিবাদই চলবে? এই সংকটই বাড়তে থাকবে, মানবসভ্যতা ধ্বংস হবে? এর আগে ধর্মীয় আন্দোলনও বারবার এগিয়েছে, পিছিয়েছে। তারা তো দাবি করত, ঐশ্বরিক শক্তিতে তারা বলীয়ান! কিন্তু হিন্দু ধর্ম বলুন, ইসলাম ধর্ম বলুন, বৌদ্ধধর্ম বলুন, খ্রিস্টান ধর্ম বলুন, কখনও এগিয়েছে, কখনও পিছিয়েছে। এক একটি ধর্মের চূড়ান্ত জয়ের জন্য কয়েক শত বছর লেগেছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে— রেনেসাঁ থেকে শুরু করে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ধরলে, সাড়ে তিনশো বছর ধরে লড়াই হয়েছে। এই লড়াই কখনও এগিয়েছে কখনও পিছিয়েছে। সেখানে ৭০ বছরের সমাজতন্ত্র কতটুকু! এই সমাজতন্ত্র দাসপ্রথা, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ— কয়েক হাজার বছর ধরে চলা ব্যক্তিগত মালিকানার

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

ছয়ের পাতার পর

শোষণকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছে। এই ব্যক্তিগত মালিকানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মানসিক জটিলতার শক্তি অতি প্রবল! সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করলেও সুপার স্ট্রাকচারে, মননজগতে, চিন্তা-ভাবনায় পুঁজিবাদী শক্তি থেকে গিয়েছিল। সেটাই পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদীদের মদতে সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করেছে। এর থেকে আগামী দিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শিক্ষা নেবে। যেমন বিশ্বে প্রথম শ্রমিক অভ্যুত্থান ফ্রান্সের 'প্যারি কমিউন'-এর পরাজয়ের থেকে সোভিয়েত বিপ্লব শিক্ষা নিয়েছে।

আরেকটা কথাও বলতে চাই, সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয় দেখিয়ে উল্লসিত বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা এবং বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবীরা প্রচার করছে, মার্ক্সবাদ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কোনও দেশের বিপ্লবের সফলতা-বিফলতার উপর মার্ক্সবাদ সঠিক কি বেঠিক নির্ভর করে না। মার্ক্সবাদ বৈজ্ঞানিক দর্শন। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই ফল কী হবে, এর সঠিক প্রয়োগের উপরই তা নির্ভর করে। যতদিন সঠিক প্রয়োগ হচ্ছিল, সমাজতন্ত্র এগিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে এই মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে যে ভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন ছিল, সেটা না হওয়ার জন্যই, অর্থাৎ স্ট্রাকচারে পরিবর্তন করা হলেও সুপারস্ট্রাকচারে তীব্রতর শ্রেণি সংগ্রাম চালানোর যে প্রয়োজন ছিল, সেটা না হওয়ার জন্যই প্রতিবিপ্লব সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। এর থেকে আগামী দিনের বিপ্লবীদের শিক্ষা নিতে হবে।

দেশের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর

সর্বশেষে আপনাদের বলতে চাই, ১৫ আগস্ট আসছে— এই স্বাধীনতা দিবসে ঝলমলে আলোক-সজ্জিত রাষ্ট্রপতি ভবনে, রাজভবনে ভোজসভা হবে। সেখান থেকে ছুঁড়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট ফুটপাতের ডাস্টবিনে পড়বে, আর ফুটপাতের হাজার হাজার শিশু সেই ডাস্টবিনে কাড়াকাড়ি মারামারি করে তা খাবে। কত লক্ষ লক্ষ ফুটপাতবাসী যাদের ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই! কত শিশু ফুটপাতেই জন্ম নেয় ফুটপাতেই মারা যায়! তারা জানেও না কে তাদের বাবা-মা, কোথায় তাদের পূর্বপুরুষের ঠিকানা! এই হল আমাদের স্বাধীনতা!

লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করছে। বাবা-মা সন্তানকে বিক্রি করে দিচ্ছে। মেয়েকে বিক্রি করে দিচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষে নারী-পাচার একটা বিরাট ব্যবসা। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ নারী ধর্ষণে শীর্ষস্থানে। আর তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবাংলা নারী পাচারে শীর্ষস্থানে। সরকার কি জানে না কারা এ সব করছে? সবই জানে। কিন্তু তাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা আছে। এই ব্যবসা যারা করে তারা সরকারি দলের ফান্ডে চাঁদা দেয়। তাই প্রশাসন চোখ বুজে থাকে। অন্ধকার নামলে রাস্তার মোড়ে মোড়ে— এই রাজভবনের পিছনে, গঙ্গের ধারে ধারে দেখবেন সারি সারি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। নিরুপায় নারীরা তাদের দেহ বিক্রি করবে সংসার চালাতে। গ্রাম থেকে মেয়েরা এখন শহরে আসে, দু-তিন দিন হোটেলে কাটিয়ে কিছু টাকা আয় করে নিয়ে যায়। এমন পরিস্থিতি যে, বাবা-মা খোঁজ নেয় না কী ভাবে এই টাকা আসছে। এই চলছে। অন্য দিকে স্থায়ী কর্মবঞ্চিত কোটি কোটি যুবক কন্ট্রাক্টরের অধীনে অতি স্বল্প মজুরিতে অতি দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে, বন্ডেড লেবার হিসাবে কাজ করছে, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার হিসাবে দেশে-বিদেশে কাজ করছে। এমনকি রুশ সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে প্রাণ হারাচ্ছে। একদিকে ১৫ আগস্টের ভুরিভোজ, আর একদিকে দেশের এই চিত্র! এই চিত্র অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই চিত্র সর্বনাশা ও ভয়ঙ্কর। কোথায় যাচ্ছে দেশ!

দেশের দুর্দিনে মহান বিপ্লবী সংগ্রামে এগিয়ে আসুন

আপনাদের বলব, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ আহ্বান জানিয়ে গেছেন— সর্বনাশা এই সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চাই সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লব। এই বিপ্লবের জন্য জনগণকে বিপ্লবী রাজনীতি বুঝতে হবে, পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে সংগ্রামের কমিটি গঠন করতে হবে, গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই সর্বাত্মক সংকটের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে অবশ্যই প্রয়োজন মহান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে লড়াই গড়ে তোলা। মনে রাখবেন, আমাদের দল ভোটসর্বস্ব পার্টি নয়। কোন দলের সঙ্গে থাকলে এমএলএ-এমপি জুটবে, মন্ত্রিত্ব জুটবে, তার পিছনে আমরা কখনও ছুটিনি। আমরা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি— জনগণের কাছে বিপ্লবী রাজনীতি নিয়ে গেছি এবং জনগণ আমাদের সমর্থন করেছেন। আমরা একমাত্র বামপন্থী দল যারা ভারতবর্ষে ১৫১টা সিটে লড়াই করেছি পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, বিপ্লবী বক্তব্য প্রচার করার জন্য। জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপন করার জন্য।

আপনাদের কাছে আবেদন, ঘরের ছেলেমেয়েরা যাতে এই নোংরা পরিবেশে নষ্ট না হয়, যাতে উন্নত চরিত্র ও মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়, তার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ছোটদের নিয়ে আপনারা খেলাধূলা করান, মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবনসংগ্রামের চর্চা করান। সামনে ১১ আগস্ট আসছে, শহিদ ক্ষুদিরামের আত্মাহুতি দিবস। এই শহিদ ক্ষুদিরামকে ভিত্তি করেই একদিন গোটা ভারতবর্ষ জেগে উঠেছিল। ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় ১১ আগস্ট উদযাপন করুন। ১৭ সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের জন্মদিন আসছে, যে শরৎচন্দ্র সে যুগে বিপ্লবের পক্ষে সাহিত্য রচনা করে গেছেন, বিদ্যাসাগরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সাহিত্য রচনা করে গেছেন। এই দিনটি উদযাপন করুন। আবার ২৬ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। এই দিনগুলো আপনারা উদযাপন করুন এবং ছাত্রদের, যুবকদের শিশু-কিশোরদের তাঁদের জীবনসংগ্রামে অনুপ্রাণিত করুন। এ কথা বলে আমি আবার আপনাদের বলব, আমাদের দলকে আপনারা সাহায্য করুন। আমাদের দল সংবাদমাধ্যমের প্রচারের ব্যাকিংয়ে নয়, আপনাদের সমর্থনে, আপনাদের নৈতিক ও আর্থিক সাহায্যেই এগিয়ে চলেছে। সংগ্রাম ও বিপ্লবের স্বার্থে চাই দলের আরও অগ্রগতি, চাই আরও ব্যাপক সমর্থন। দেশের এই দুর্দিনে মহান বিপ্লবী সংগ্রামে সৎ-সাহসী যুবক-যুবতীরা এগিয়ে আসুন। এই কথা বলে আমি শেষ করছি।

রাস্তা ছাড়বে না মানুষ

একের পাতার পর

সিবিআইয়ের আচরণ থেকে মনে হবে যেন ব্যাপারটা শুধু তাদের নিজেদের দুই পক্ষেরই, যে লক্ষ লক্ষ জনতা এই ধর্ষণ ও মৃত্যুর যথাযথ তদন্ত ও বিচার চেয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে, রাত জেগেছে, শত-সহস্র মিছিল করেছে গভীর আবেগে, উদ্বেগে উদ্বেলিত হয়েছে, যেন তারা কিছুই নয়, তাদের উদ্বেগ, আগ্রহ, চাওয়ার যেন কোনও মূল্যই নেই। জনগণের এই আবেগকে অগ্রাহ্য করার, অবজ্ঞা করার এমন মনোভাব গণতান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে মেলে কি? দেশের সাধারণ মানুষ অন্তত তা মনে করে না।

সিবিআই রিপোর্টের পরদিন আর জি করের আন্দোলনরত চিকিৎসকরা গিয়েছিলেন তাদের দপ্তরে তদন্তের অগ্রগতি জানতে। জানাতে রাজি হননি সিবিআই অফিসাররা। ফলে চিকিৎসকরা তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন। খুবই স্বাভাবিক তাঁদের এই প্রতিক্রিয়া। হাইকোর্ট যে প্রবল গণআন্দোলনের চাপে পড়েই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল, এ নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তাই চিকিৎসকরা সারা দেশের উদ্বিগ্ন জনগণের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়ে ঘোষণা করেছেন, আন্দোলনের চাপ যদি না থাকে, কোনও পুলিশ, কোনও সিবিআই, কোনও বিচারালয়— কারও তদন্ত, দোষীদের চিহ্নিত করা এবং শাস্তি দেওয়ার কাজ এক ইঞ্চিও এগোবে না।

মনে রাখা দরকার, পুলিশ, সিবিআই কিংবা বিচারব্যবস্থা সবই এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ। এই ব্যবস্থা দুর্নীতির যত গভীর পাঁকেই ডুবুক, মহিলাদের উপর অত্যাচার যতই ভয়াবহ আকার নিক, তবুও জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াক, সরকারের অপদার্থতা, বেআইনি কার্যকলাপ, দুর্নীতি, অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠুক, এই ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলুক— এরা কেউই তা চায় না। যে ভাবে 'আর জি করের বিচার চাই' আন্দোলন কলকাতা মহানগরীর সীমানা ছাড়িয়ে রাজ্যের গ্রাম-শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে সারা দেশে এবং দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রমাগত স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র নিয়ে আরও বেশি বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে, তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে শাসক শিবির। তাই সেই আন্দোলনকে স্তিমিত করে দিতে, বিক্ষোভের আগুনে জল ঢেলে দিতেই কি এই তদন্ত তদন্ত খেলা, তদন্তের নামে এই দীর্ঘসূত্রতা! তারা জানে এই দুর্নীতি চক্রের শিকড় কেন্দ্র-রাজ্য সহ সব সরকার ও প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে। গোটা ব্যবস্থাটাই দুর্নীতিগ্রস্ত। সঠিক তদন্ত হলে দেখা যাবে এর শিকড় প্রতিটি হাসপাতালের অন্দরে, সরকারের প্রতিটি বিভাগে, এই সরকার ছাড়িয়ে আগের সরকারে ছড়িয়ে রয়েছে। আর দেশের মানুষ যদি শিকড়ের সেই মহাজাল ধরতে পারে, তবে এই বিক্ষোভ শতগুণে ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠবে, এই সর্বব্যাপক দুর্নীতির জন্ম দেয় যে সমাজব্যবস্থা তার রক্ষক সরকারি দলগুলোর একে অপরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? প্রশ্ন উঠবে, এক দলের বদলে আর এক দলকে সরকারে বসানোর দাবি কি আসলে পচা ক্ষতস্থানে পুলটিস লাগানোর মতো ব্যাপার নয়? এই প্রশ্ন উঠলে উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষ ধরে ফেলবে দুর্নীতির উৎস এই পচাগলা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার আসল চেহারাটাকে। তাকে ছুঁড়ে ফেলার আকুতি তৈরি হবে মানুষের মনে।

তাই আজ যদি এই রাষ্ট্রের হাত থেকে ন্যূনতম সুবিচারের দাবি আদায় করতে হয় তবে আন্দোলন প্রবল ভাবে জারি রাখতে হবে শুধু তাই নয়, আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে হবে। এবং সেই আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ততার জায়গায় ফেলে রাখলে চলবে না। তাকে সংগঠিত রূপ দিতে হবে, আন্দোলনের মধ্যে সমাজ বদলের লক্ষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। না হলে প্রবল আন্দোলনের চাপে একটা ধর্ষণ-খুনের বিচার আদায় হলেও ঠিক একই সময়ে আরও বিশটা এমন ঘটনা ঘটে যাবে, ঘটতে থাকবে।

অত্যন্ত আশার কথা, সাধারণ মানুষ, বিশেষত মহিলারা এই আন্দোলনে যে ভাবে অংশগ্রহণ করছেন, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, আইনজীবী প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রের মানুষ যে ভাবে অংশ নিয়েছেন, যে ভাবে তা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-অধ্যাপকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তা যেমন গণআন্দোলনের ইতিহাসে নতুন নজির তৈরি করল, তেমনই তা প্রমাণ করল, রাজ্যে পর পর ক্ষমতাসীন শাসকরা বাংলার সংগ্রামী প্রাণসত্তাকে আজও সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি। আশার কথা, তাঁরা সকলেই সুবিচারের দাবিতে অনড়, আন্দোলন চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই শাসকদের কোনও ছল, কোনও চাতুরিই যে এই আন্দোলনকে দমন করতে, বিপথগামী করতে পারবে না, তা জোর দিয়েই বলা যায়।

মিড-ডে মিল কর্মীদের মালদা জেলা সম্মেলন

মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, বছরের ১২ মাসই বেতন দেওয়া, পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধি ও সামাজিক সুরক্ষা সহ ১৩ দফা দাবিতে ১৭ আগস্ট এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের প্রথম মালদা জেলা সম্মেলন হরিশ্চন্দ্রপুর তুলসীহাটা উপবাজার চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পণ্ডা। উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সির মালদা জেলা সম্পাদক অংশুধর মণ্ডল, কমিটির সদস্য কার্তিক বর্মন। রাজ্য সম্পাদিকা মিড-ডে মিল কর্মীদের সমস্যাগুলি তুলে ধরে আন্দোলনের আহ্বান জানান। তিন শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। রোওশনারা বিবিকে সভাপতি, সাথী চৌধুরীকে সম্পাদিকা ও উমা সরকারকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে করে ১৬ জনের কমিটি গঠিত হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 5 Bengali Weekly Auguat 30, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

আর জি কর আন্দোলনে বন্দি
২২ কর্মী এখনও জেলে

আর জি করের ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে এবং ১৪ আগস্ট রাতে হাসপাতালে দুষ্কৃতীদের ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে সারা রাজ্যের মতো জলপাইগুড়ির মানুষ ১৬ আগস্ট এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকা ধর্মঘটকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমর্থন করেন।

ধর্মঘটের সমর্থনে দলের কর্মীরা মিছিল করার সময় জলপাইগুড়ি শহরে পুলিশ ২২ জনকে গ্রেপ্তার করে, এঁদের মধ্যে ৩ জন মহিলা। তাঁদের নামে নানা মিথ্যা অভিযোগ এনে জামিন অযোগ্য ধারা দিয়ে আজও আটকে রেখেছে পুলিশ। অবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন শহরের সর্বস্তরের মানুষ, চলছে মিছিল, সভা। ২৭ আগস্ট জলপাইগুড়ি শহরে দলের ডাকে বিক্ষোভ মিছিল হয়।

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে
বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানকর্মীরা রাস্তায়

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে ২৪ আগস্ট বিজ্ঞানী সমাজের ডাকে কলকাতায় রাজাবাজারের বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত এক প্রতিবাদী পদযাত্রা সংগঠিত হয়। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে এই পদযাত্রায় পা মেলান বহু বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী সহ বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষ।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক পার্থপ্রতিম মজুমদার (প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর, এনআইবিএমজি), অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী (প্রাক্তন ডিরেক্টর, আইআইএসইআর কলকাতা) অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় (আন্তর্জাতিক ইনসা ভূবিজ্ঞানী) সহ অসংখ্য বিজ্ঞানী, গবেষক অধ্যাপক, শিক্ষক ও বিজ্ঞান অনুরাগী মানুষ এই পদযাত্রায় অংশ নেন। ডঃ মজুমদার বলেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতো আমরাও বিবেকের তাড়নায় আজ প্রতিবাদে সামিল হয়েছি। অধ্যাপক ব্যানার্জী বলেন, যুগে যুগে সকল বরেণ্য বিজ্ঞানী অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। আজ এই অসহনীয় সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার না করে বিজ্ঞানীরা কেবল ল্যাবরেটরিতে নিজেদের আটকে রাখলে তা অন্যায় হবে। আগামী দিনে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান ভূ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞানী সমাজের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়, প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অন্যথায় এই প্রতিবাদ-আন্দোলন চলবে।

কাটোয়ায় পর পর গণধর্ষণ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

১৫ আগস্ট পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় এক গৃহবধূকে গণধর্ষণ এবং ২০ আগস্ট ওই থানারই একটি গ্রামে একজন তরুণীকে ধর্ষণ— পরপর দুটি ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, হোটেলগুলিতে কড়া নজরদারি, নারীদের নিরাপত্তা, মদের ঢালাও প্রসার রোধ সহ অন্যান্য দাবিতে ২২ আগস্ট এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) কাটোয়া লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের দফতরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সেখানে আর জি কর, বর্ধমান, বোলপুর সহ অন্যান্য স্থানের এই ধরনের পৈশাচিক ধর্ষণ ও খুনেরও প্রতিবাদ করা হয়। ডেপুটেশনের আগে দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখানোর সময় বহু মানুষ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।

ছাত্র আন্দোলন নিষিদ্ধ করার ফতোয়া
কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিধ্বনি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুলছাত্রদের প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই সরকারি ঘোষণার বিরুদ্ধে এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ২৪ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা এই নির্দেশিকাকে চরম অগণতান্ত্রিক এবং ষড়যন্ত্রমূলক বলে মনে করি। এই নির্দেশিকা ১৯০৫ সালে কুখ্যাত ব্রিটিশ সরকারের কার্লাইল সার্কুলারকে মনে করিয়ে দিল। সেদিনও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ আটকাতে এমনই এক কালা সার্কুলার এনেছিল। এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "ছাত্ররা সকল সময় সকল বিষয়ে শিক্ষাগুরুদের অনুবর্তী হইয়া চলিবে তাহা সম্ভবপর নহে, সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও নহে। ছাত্ররা যদি আবাল বৃদ্ধ বনিতার সাথে বর্তমান আন্দোলনে যোগ দিয়া থাকে, তবে তা আনন্দেরই কথা। ... আজ যে ছাত্ররা উন্মত্ত, জনসাধারণ উত্তেজিত ও বৃদ্ধরা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে মনে হয় সকলে মিলিয়া দেশকে এই মহাসঙ্কট থেকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন।"

আজ দেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও দেশজুড়ে যে চরম সঙ্কট, বিশেষত আর জি কর মেডিকেল কলেজের নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যেভাবে সমস্ত কুণ্ঠা, পিছুটান, চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে লড়াই আন্দোলনে নামছেন তাকে শাসক ভয় পেয়েছে। এই আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরবর্তী সময়ে দেশ জুড়ে যে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেই সমস্ত আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের মতোই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাত্র সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে ভয় পেয়ে তাকে দমন করার জন্য স্বৈরাচারী নির্দেশিকা দিয়েছে।

এর মধ্য দিয়ে সমাজ প্রগতির চিন্তাকেই বাধা দিতে চাইছে সরকার। এআইডিএসও এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অপচেষ্টা অবশ্যই ছাত্র সমাজ ব্যর্থ করবে। অভিসন্ধিমূলক এই সরকারি নির্দেশিকা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

- আর জি করে নৃশংসতার দ্রুত তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি
- সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষার দাবিতে

এ আই ডি এস ও-র ডাকে

কলকাতা চলো

৩ সেপ্টেম্বর

কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার, জমায়েত ঃ বেলা ১২টা

AIDSO

আর জি কর ঃ প্রতিবাদে পথে বিশিষ্টজন

সাহিত্য পত্রিকা, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও নাট্যকর্মীদের ডাকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিজয়গঞ্জে প্রতিবাদ সভা। ২২ আগস্ট

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com